প্রতিবেদন

X ফাইল

লঞ্চডুবির তদন্ত রিপোর্ট

লিখেছেন **জয়ন্ত আচার্য** ও **আসাদুর রহমান**

চার শতাধিক যাত্রী নিয়ে মেঘনায় এমভি সালাউদ্দীন-২ ৩ মে রাতে ডুবে যায়। রাত তখন প্রায় ১১টা। দুর্ঘটনার পরদিন সকালে নারায়ণগঞ্জ থেকে উদ্ধারকারী জাহাজ রুস্তম ঘটনাস্থলে পৌঁছে। বিআইডব্লুটিএ কর্তৃপক্ষ জানতেন, একশ টন ওজনের সালাউদ্দীনকে রুস্তম তুলতে পারবে না। কারণ তার নিজের ওজনই ৫০ টন। তবু বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃপক্ষ উদ্ধারের জন্য প্রথমে রুস্তমকে পাঠায়। দুর্ঘটনার প্রায় দুই দিন পর বরিশাল থেকে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকারী জাহাজ হামজা। হামজা ও রুস্তম কয়েক ঘন্টা চেষ্টা করে উদ্ধার করল নিমজ্জিত লঞ্চ সালাউদ্দীনকে। পরিকল্পিত এই কালক্ষেপণের উদ্দেশ্য সফল হলো বিআইডব্লুটিএ'র কর্তৃপক্ষের। প্রায় তিন দিন পানির মধ্যে হতভাগ্য যাত্রীদের লাশ থাকায় বিকৃত হয়ে গেল তাদের চেহারা। কিছু লাশ ভেসে গেল। চেষ্টা হলো দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ ও অপরাধীদের আড়াল করার। লাশগুলোকে বিকৃত করে ফেলার। গত দশ বছর লঞ্চডুবির পর বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃপক্ষ এমন আচরণ করেছে বলে অতীতের বিভিন্ন তদন্ত কমিটির রিপোর্ট থেকে জানা গেছে। অতীতে প্রতিটি লঞ্চডুবির পর তদন্ত কমিটি হয়েছে। তদন্ত কমিটি প্রত্যেকটি রিপোর্টে বলেছে নিমজ্জিত লঞ্চ উদ্ধারে কালক্ষেপণ করা হয়েছে। আড়াল করার চেষ্টা হয়েছে প্রকৃত ঘটনা। কিছু লাশ পরিকল্পিতভাবে লঞ্চ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। বিকৃত লাশ চিহ্নিত করতে পারেনি প্রিয়জনেরা। এ কারণে ক্ষতিপূরণ তারা দাবি করতে পারেনি। রুস্তম ও হামজা ৬ মে যখন সালাউদ্দীন-২ কে উদ্ধার করে তখন ভেসে উঠল গলিত লাশ। অধিকাংশ লাশই বস্ত্রহীন। ফুলে ফেঁপে বিকৃত হয়ে গেছে। প্রিয়জন লাশটি বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পর অপেক্ষায় থাকা আত্মীয়রা লাশ চিহ্নিত না করতে পেরে আরো ভেঙে পড়ে। শুধু লঞ্চ থেকেই উদ্ধার করা হয় ৩০৩টি বিকৃত লাশ। পরে মেঘনার বিভিন্ন জায়গা থেকে আরো ৪০টি লাশের সন্ধান মেলে। অথচ প্রাথমিকভাবে বিআইডব্লুটিএ কর্তৃপক্ষ প্রচার চালাতে থাকে লঞ্চে যাত্রী ছিল মাত্র দেড়শ'জন।

নৌপথে : একই চিত্র

ষাটনলের বিয়োগান্তক ঘটনার লাশ উদ্ধারের কার্যক্রম শেষ হয়েছে। ৯ মে পর্যন্ত উদ্ধারকৃত লাশের সংখ্যা ৩৭৮-এ এসে দাঁড়িয়েছে। দুর্ঘটনার পরদিন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপসচিবের নেতৃত্বে তিন সদস্যের পৃথক দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপসচিবের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। অন্য

অপ্রকাশিত তদন্ত রিপোর্ট : অভিন্ন তথ্য

- প্রতিটি লঞ্চ ডুবির পর উদ্ধারের জন্য প্রথমে পরিকল্পিতভাবে কম ওজন সম্পন্ন রুস্তমকে পাঠানো হয়।
- উদ্ধারের নামে রুস্তমের কালক্ষেপণের পর আসে হামজা।
- ডুবুরিদের হাত করে মালিকরা লঞ্চ থেকে লাশ বের করে ভাসিয়ে দেয়। যাতে মৃতের সংখ্যা কম দেখানো সম্ভব হয়।
- কালক্ষেপণ করে হতভাগ্য যাত্রীর দেহকে পচিয়ে ফেলা হয়, যাতে নিকটাত্মীয়রা লাশ চিহ্নিত করতে না পারে।
- দুর্ঘটনায় পতিত কোনো লঞ্চ নকশা অনুযায়ী করা হয়নি।
- প্রতিটি লঞ্চই অতিরিক্ত যাত্রী ও মালামাল বহন করা অবস্থায় দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে।

কমিটি গঠিত হয় সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের মার্কেন্টাইল মেরিন ডিপার্টমেন্টের প্রিন্সিপাল অফিসার আব্দুল হকের নেতৃত্বে। উভয় কমিটিকে ৭ দিনের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়।

গত ১২ মে পর্যন্ত একটি রিপোর্ট জমা পড়ে। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের প্রিন্সিপাল অফিসার আব্দুল হককে আহবায়ক করে গঠিত তদন্ত কমিটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। সালাউদ্দীন-২ দুর্ঘটনার জন্য এর মাস্টার, সুকানি ও মালিকসহ সংশ্লিষ্টদের চরম গাফিলতিকে দায়ী করা হয়। রিপোর্টে দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যাওয়া সাক্ষীদের জবানবন্দি, সার্ভে সার্টিফিকেট, দুর্ঘটনাকবলিত লঞ্চের ছবিসহ বেশ কিছু প্রমাণপত্র সংযোজন করা হয়। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার জন্য অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অতিরিক্ত যাত্রী ও মালামাল বোঝাই এবং কালবৈশাখীর ঝড়কে মূল কারণ বলে উল্লেখ করা হয়। রিপোর্টে অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল অধ্যাদেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা এবং নিহতদের আত্মীয়-স্বজনকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়। এই কমিটিতে সদস্য হিসেবে ছিলেন সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের মুখ্য ইন্সপেক্টর রাজেন্দ্র বিশ্বাস এবং একই অধিপ্তরের ম্যাজিস্ট্রেট অ্যান্ড মেরিন সেফটি অফিসার মোহাম্মদ রহিম।

লঞ্চটির ট্রাফিকিং, ব্যবস্থাপনা, সিগন্যালিং দিকটি খতিয়ে দেখার জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব বিডি মিত্রকে আহ্বায়ক করে অন্য যে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল সে তদন্ত কমিটির কাজ এখনও শেষ হয়নি। সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে এই কমিটিকে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় আরও ৭ দিন সময় বাড়িয়ে দিয়েছে। সমুদ্র অধিদপ্তরের মুখ্য অফিসার রাজেন্দ্র সরকার ২০০০কে বলেছেন, তদন্ত কার্য চলছে। আমরা খতিয়ে দেখছি প্রকৃত কারণ। সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে এখনও নৌপথে চলছে একই চিত্র।

তদন্ত রিপোর্ট : অভিন্ন তথ্য

নিয়ম না মেনেই দীর্ঘদিন ধরে চলছে নৌযানগুলো। ঢাকা ও বরিশাল রুটে লঞ্চগুলো চলছে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে। অতিরিক্ত মাল ও যাত্রী বোঝাই এ লঞ্চগুলোর স্বাভাবিক চিত্র। এ কারণে এ রুটেই সবচেয়ে বেশি লঞ্চ দুর্ঘটনা ঘটে। গত দশ বছরে এ রুটে লঞ্চ ডুবিতেই তিন হাজার লোক মারা গেছে। প্রতিটি লঞ্চডুবির পর তদন্ত কমিটি হয়েছে। তদন্ত কমিটি রিপোর্টও দিয়েছে। জনগণের সামনে এ রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি। তবে তদন্ত রিপোর্টগুলোতে অভিন্ন বেশ কিছু কারণ ও সুপারিশ উত্থাপন করা হয়েছে। গত দশ বছরের তদন্ত রিপোর্ট যাচাই করে দেখা গেছে, কোনো লঞ্চের মালিক ও চালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। দুর্ঘটনা কবলিত লঞ্চটি আবারও অন্য নামে অন্য রুটে ফিরে এসেছে। দুর্ঘটনা কবলিত কোনো লঞ্চই অবকাঠামো নকশা অনুযায়ী তৈরি নয়। প্রতিটি দুর্ঘটনায় পতিত লঞ্চের চালক ছিল অদক্ষ। নিমজ্জিত লঞ্চ উদ্ধারে হামজাকে প্রথমেই পাঠানোর প্রয়োজন হলেও রুস্তমকে পাঠানো হয়। পরিকল্পিতভাবে কালক্ষেপণ করা হয়েছে। চেষ্টা হয়েছে মৃতের সংখ্যা লুকানোর। কোনো লঞ্চের যাত্রী বীমা থাকে না। অথচ লঞ্চটি ঠিকই বীমা করা থাকে। দুর্ঘটনা রোধে প্রতিটি তদন্ত কমিটি ধারণ ক্ষমতার চেয়ে কম যাত্রী ও মাল বোঝাইয়ে সুপারিশ করেছে। প্রতিবছর ফিটনেস পরীক্ষার ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলেছে। বলেছে লঞ্চে প্রয়োজন মতো বয়া রাখার কথা। তাদের কোনো সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি। তদন্ত রিপোর্ট চলে গেছে হিমাগারে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা ২০০০কে বলেন, বিগত বেশ কয়েকটি তদন্ত কমিটির সদস্য আমি ছিলাম। তদন্ত হয়। অতীতের সঙ্গে তদন্ত রিপোর্টের মিল থাকে। কারণ অসাবধানতার কারণে ঘটনার শুধু পুনরাবৃত্তি হয়।